গোয়েন্দা গল্প

জুহু বিচে তদন্ত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পায়চারি করে যখন কেয়ারি-করা রঙ্গন গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই রাখহরি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতারণার খবর।

রাখহরি বলল, "আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসব ?"

আমি রাখহরির মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "নাঃ, থাক। আমিই ভেতরে যাচ্ছি।" বলে ঘরে এসেই ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম। যেখানে ফোন করলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধরল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টের ওই ঘরটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি যখন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খবরের বিষয়বস্তুর ওপর মন রেখেছি, রাখহরি তখন চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। যে খবরটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা এইরকম, গতকাল দুপুরে বউবাজার অঞ্চলে একটি গয়নার দোকানে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার গয়না কেনেন। তারপর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য রসিদ না নিয়েই চলে যান। দোকানদারও টাকা গুনে সিন্দুক ভর্তি করে খদ্দেরকে বিদায় দেন। এইরকম খদ্দের যে এই প্রথম তা নয়, মাঝেমধ্যেই এইরকম দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারেও এইরকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকার সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিয়ে দলিল করা হয়। এতে অনেক টাকার স্ট্যাম্পপেপার বেঁচে যায়। সে যাক, রহস্য ঘনাল এর পরেই। ওই দম্পতি গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার পরই আরও দু'জন খদ্দের আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁরাও ওই একই দামের গয়না কিনে নিয়ে রসিদ নিয়ে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদার বিনীতভাবে বলেন, "আমার টাকাটা ?"

দম্পতি বলেন, "টাকা তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।"

দোকানদারের চোখ কপালে উঠে যায়, "সে কী মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন ?"

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, "ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী।" সে এক মহা কেলেঙ্কারি। খদ্দের ও দোকানদারের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে দম্পতিকে বলে, "আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

দম্পতি বলেন, "আছে বইকী। প্রতিটি নোটের নম্বর আমাদের কাছে নোট করা আছে। এই দেখুন।" পুলিশ তখন দোকানদারের সিন্দুক খুলিয়ে টাকা বের করে নোটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। প্রতারকরা সসম্মানে তাঁদের গয়না নিয়ে চলে যান। আর দোকানদার? মাথা হেঁট করে বসে থেকে জনসাধারণের ধিক্কার এবং বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ হজম করতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রতারণার ব্যাপার সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একই চক্রের হয়ে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে দোকানকার এই প্রতারণার বলি হয়েছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। নাম গুণধর পাইন। ফরসা রং। মাঝারি চেহারা। সব সময় মুখে পান আর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ হেন লোক যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিয়ে রেখে যখন বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি সেই সময় রাখহরি এসে বলল, "এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন?"

"বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও আছে।"

"ওঁদের ভেতরে আসতে বলো। আর চা করো সকলের জন্য।"

একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। চেহারা না দেখেই বললাম, "আসুন, গুণধরবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণধরবাবু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কী করে জানলে আমি এসেছি?"

"আজ সকালে আপনার গুণের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দেখেই অনুমান করেছি, এইবার আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে।"

গুণধরবাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ করলে বললাম, "এই ছেলেটি কে?"

"আমার একজন কর্মচারী।"

রাখহরি চা দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল করে শুনলাম গুণধরবাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, "এখন আমাকে আপনি কী করতে বলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়ার তা হয়েইছে। এই ব্যাপারে আইন আদালত করতে গেলে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহু কষ্টে পুলিশি ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদের তুমি খুঁজে বার করো।"

"তাতে লাভ? আপনার গয়না কি আপনি ফেরত পাবেন?"

"না। গয়নাও পাব না। টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপরাধী ধরা পড়ুক।"

আমি বললাম, "এই ধরনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে রয়েছে তারা, কোন সূত্র ধরে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোরের কোনও কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?"

"তা হলে?"

"চেষ্টা অবশ্যই করব। করছিও।" বলেই আর একবার উঠে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।

এবারে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইনস্পেক্টর ভদ্র? আমি অম্বর বলছি। অম্বর চ্যাটার্জি।"

"হ্যাঁ বলুন। কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম।"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে কেউ নেই? ফোন ধরল না কেন?"

"জানেন তো আমি ব্যাচিলর মানুষ। আর কাজের লোকটির আন্ত্রিক দেখা দেওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। একটা ব্যাপারে আমি আপনার একটু হেল্‌প চাইছি। কাল বউবাজারে একটি গয়নার দোকানে...।" লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনার গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিয়েই এসেছি আমি।"

"তা হলে ড্রাইভারকে বলুন, একবার সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের নিয়ে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলার স্বর্ণখনির কাছে নয়, এই কলকাতার মধ্যেই।"

রাখহরিকে আজকের জন্য একটু মাংস-ভাত করে রাখতে বলে গুণধরবাবুকে নিয়ে সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে এলাম।

ইনস্পেক্টর ডি.কে. ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকরিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকের সত্যিই প্রয়োজন। খুব শান্ত প্রকৃতির কিন্তু রাগলে ভীষণ।

আমরা যেতে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের। তারপর ধীরেসুস্থে গুণধরবাবুর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন, "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বের হয়। তবে কলকাতা শহরের বুকে দিনদুপুরে এইরকম প্রতারণা সত্যিই নজিরবিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধরের হয়ে আমি বললাম, "দেখুন, কেসটা যেরকম তাতে দোকানদারকে যে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এটা কি আপনি বুঝতে পারেননি? ওই দম্পতিকে চলে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে আপনি যদি ওদের জেরা করতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন বা ওদের পেছনে ধাওয়া করে ঠেরাটা দেখে আসতেন তা হলে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মারাত্মক তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু মুশকিল হল গুণধরবাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন করলেন যে, মনে হয়েছিল উনিই আসলে খদ্দেরকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই আমরা ওঁকেই ভর্ৎসনা করছিলাম। ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পতি দু'জনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধরবাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধরবাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম নন্দ।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

নন্দর হয়ে গুণধরবাবুই বললেন, "ওর বাড়ি হরিপালের কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা মরা ছেলে। আমার কাছেই মানুষ।"

নন্দকে বললাম, "ওই মুখগুলো আর একবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ পারব।"

"আচ্ছা, ওঁদের কাউকে আর কখনও এই দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?"

"মনে হচ্ছে একবার যেন দেখেছিলাম।

দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুরবেলা এসে আমার কাছ থেকে ডিজাইনের বইটা চেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।"

"ব্রজদা! ব্রজদা কে?"

"আগে কাজ করত আমাদের দোকানে।"

"এখন করে না?"

"না।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "সেদিন দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "আমি বরাবরই বিকেলের দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওয়ায় সব সময়ই আমাকে দোকানে থাকতে হয়।"

"আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায়?"

"ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিয়ে ও এখন বম্বের জাভেরি মার্কেটে ভাল রোজগার করছে।"

"ওর বাড়ি কোথায় জানেন?"

"ডোমজুড়ের কাছে নিবড়ে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজারেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভাল ছেলে। ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"সন্দেহ করছি না তো। তবে একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাই একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।"

ইনস্পেক্টর ভদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বউবাজারের মেসে এসে ব্রজর বম্বের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওর দু-একটা চিঠিপত্তর যা বন্ধুদের লিখেছিল, তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওর দু-একটা ফোটোও সংগ্রহ করলাম বন্ধুদের কাছ থেকে। যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অর্থহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, "আপনি এত দেরি করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।"

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত! সেই প্রেস ফোটোগ্রাফার ছেলেটি?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবার আসবেন সন্ধের সময়। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দরকার।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দরকার যে, এইভাবে থাকতে বলল?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ রেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন না করেই অশোকের রেখে যাওয়া কাগজের পাতায় চোখ বোলালাম। নতুন বেরিয়েছে কাগজটা। লোকের হাতে-হাতে না ঘুরলেও হকাররা রাখে। বিক্রিও হয়। সেই কাগজের প্রথম পাতায় বউবাজারের প্রতারণার বিবরণটা ফলাও করে ছাপা তো হয়েইছে, সেই সঙ্গে রয়েছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র। যাতে দেখা যাচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে সেই দম্পতি অপেক্ষমাণ একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে মনের আনন্দে স্নান-খাওয়া সেরে বারবার সেই ছবির মুখগুলো দেখতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়, অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয়। সবারই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকের কথামতো আমি সারাটা দিন ঘরে রইলাম। কিন্তু না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পার হয়ে গেল তবুও অশোক এল না। রাত্রিবেলা ওর কাগজের অফিসে ফোন করলাম। সেখান থেকেও ওর কোনও খোঁজখবর দিতে পারল না কেউ।

সে রাত্রে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে করে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালে কাগজেই খবর পেলাম, অশোকের মৃতদেহ মধ্যরাত্রে কে বা কারা যেন ওদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে গেছে।

শিউরে ওঠার মতো খবর। চক্রটি যে শুধু প্রতারণা করে, তাই নয়। খুন করতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিরীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা করতে পারে তা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধারণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলাম গুণধর পাইনের ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ। এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না। সে ছিল প্রথমজন।"

তারপর সোজা চলে এলাম সদর দফতরে। সেখানেও পুলিশের সংগ্রহে থাকা অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব, তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে, তা নয়। সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। তবু...

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদিন অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। কাগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম। বেশি খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়াল পুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, "কী আশ্চর্য! এঁরা তো আমাদেরই অতিথি। প্রায়ই আসেন এখানে।"

"আমি একটু দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, "সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।"

"সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও?"

"না। ঘর খালি আছে।"

"একবার দেখতে পারি ঘরটা?"

"আপনার পরিচয়?"

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভিটি টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু'জনের। মিঃ পি কে সিনহা এবং মিসেস মিরার। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস চাপরাশি কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি।

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি.আই.পি কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে

এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি। ইনস্পেক্টর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম। তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল।

যথাসময়ে বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম. কে. নম্বরির দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, "ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা। পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"কোথায় গেছেন উনি।"

"আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা ?"

"আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব। তাই।"

"এ কাজে দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি ?"

"আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।"

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। রেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকানা আমাদের দিয়েছে সেটাও আন্ধেরির।

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয় ঘরে তালা দেওয়া। আমরা সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম। আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জুহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিনে-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বারবার সিগারেট ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, "একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র ?"

"হ্যাঁ। ইনিই তো সেই ব্রজগোপাল।"

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জ্বেলে ধরলাম সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, "আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।"

"বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি ?"

"মাঝে-মাঝে গেছি হয়তো, সোনাদানা কিনতে।"

"বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায় ? আপনি গুণধর পাইনকে চেনেন ?"

আর চেনা। ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই দৌড় শুরু করল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধরেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কে, কে, কে আপনারা ? আপনারা কারা ? আমি আপনাদের চিনি না।"

আমি তখন ওর পেটের কাছে রিভলবার ধরে বললাম, "আমাদের তুমি নিশ্চয়ই চিনবে ব্রজদুলাল।"

"আমি ব্রজদুলাল নই। আপনারা ভুল করছেন। আমি ব্রজগোপাল।"

"এখানে কোথায় এসেছিলে ? দিদির বাড়ি ?"

"আমার কোনও দিদি-টিদি নেই।"

আমি খবরের কাগজের কাটিংটা ওর দিকে মেলে ধরে বললাম, "এঁদের তুমি চেনো ? এরা কারা ? এখানকার সাউথপরেন্ট ব্লকে ফিফথ ফ্লোরে কারা থাকে ?"

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, "সব বলব আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক ?"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমরা ওত পেতে আছি তোমাদের ধরবার জন্য। ওঁদের ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেছেন ওঁরা ?"

"আমরা সবাই গিয়েছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিরেছি।"

"তা হলে চলো। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করিয়ে দাও।"

জুহু বিচ ঘিরে তখন উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। আমরা হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিয়ে লোকাল থানায় একটা ফোন করলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপারটা। তারাই এখানকার ফোন নম্বর আমাদের দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হল না।

আমরা ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁরা। আমাদের দু'জনের হাতে রিভলবার আর ব্রজগোপালের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে, তা অনুমান করতে পারলেন।

একটু পরেই স্থানীয় পুলিশও এসে গেল।

জেরার মুখে অপরাধ স্বীকার করল অপরাধীরা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গয়না। ব্রজগোপাল স্বীকার করল, এরাই তার নিজের দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবুই তাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতারণার পরিকল্পনা করে ওরা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ করে নিজেরা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্ক স্ট্রিটের শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতারণা ছাড়াও আরও অনেক বাজে কাজ তাঁরা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড়-বড় শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বমাল সমেত ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকেও পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি.টি-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবু এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী